ভারতীয় সমাজ, শিক্ষা এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর চিন্তাধারার প্রাসঙ্গিকতা

কস্তুরী কর
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, সম্মিলনী মহাবিদ্যালয়

সারাংশ: সময়ের হাত ধরে সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটেছে। উনবিংশ শতকের পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা কি হবে তা নিয়ে সেই সময়ের বুদ্ধিজীবীদের বিস্তর দ্বন্দ্ব ছিল। যেহেতু উনিশ শতকের রেনেসাঁ বা নবজাগরণ বাংলাকে বেশি স্পর্শ করেছিল তাই বাংলার বুদ্ধিজীবীদের এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা বড় বেশি ছিল। উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। যিনি শুধুমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুকরণ নয় বরং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবধারার মেলবন্ধনে যে শিক্ষা তার পক্ষপাতী ছিলেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে তার ঐতিহ্য ও আধুনিকতার ভারসাম্যের ধারণা আজকের দিনেও সমান প্রাসঙ্গিক।

সূচক শব্দ: ভারতীয় সমাজ, শিক্ষা ব্যবস্থা, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবীরা, আধুনিকীকরণ

ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতি ঘটে কিভাবে বর্তমান রূপ ধারণ করলো এবং তাতে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কি ভূমিকা বুঝতে হলে আমাদের কিছুটা পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখতে হবে যে যুগ যুগ ধরে ভারতীয় সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থা কিভাবে গড়ে উঠেছিল। গবেষকদের কাছে এটা একটা মৌলিক বিষয় হয়ে রয়েছে যে সমাজ ও সমাজে বসবাসকারী মানুষজন তাদের চাহিদা পূরণের নিমিত্তে কি প্রয়োজন মত সেইরকমই শিক্ষা পদ্ধতি গড়ে তোলে। এ চাহিদাগুলো নানাবিধ আকার ধারণ করিতে পারে যথা, খাদ্য উৎপাদন, মনোরঞ্জন,আত্মরক্ষা, ধর্মসংক্রান্ত ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় সবসময় সমাজের প্রয়োজন পূরণের উপায় হয়ে থেকেছে।

ভারতীয় উপমহাদেশ হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্ন রাজতান্ত্রিক ও ধর্মীয় আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং এই বিষয়গুলো ভারতীয় সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচলিত ভারতীয় শিক্ষা ও তার সঙ্গে পশ্চিমী শিক্ষার যে সংঘাত সেই প্রেক্ষিতে বিশেষভাবে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও তৎকালীন

মনীষীদের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তবে তার আগে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কিভাবে ভারতীয় শিক্ষা প্রণালী পরিবর্তিত হয়েছে তার একটি সামগ্রিক রূপরেখা দেওয়া প্রয়োজন।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন ছিল জানার জন্য খুব বেশি তথ্য আমাদের হাতে নেই। বৈদিক যুগে শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল ধী শক্তি বৃদ্ধি। যার প্রমাণ গায়ত্রী মন্ত্রে পাওয়া যায়। বৈদিক শিক্ষার অন্যতম যে বৈশিষ্ট্য ছিল তা হল গুরু শিষ্য পরম্পরা। শতপথ ব্রাহ্মণে উপনয়নের যে বর্ণনা আছে তা পরবর্তীকালে গৃহ্য সূত্র সমূহের বর্ণিত উপনয়নের বিস্তৃত বিবরণের সংক্ষিপ্ত প্রাচীনতর রূপ। উপনয়নের মূল কথা হচ্ছে ছাত্র শিক্ষা লাভার্থে গুরুর সম্মুখে উপনীত হবে এবং গুরু তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করবে। শিষ্যকে সত্যবাদী ব্রতধারী আচার্যের প্রতি সেবাপরায়ণ, সৌজন্য ও আতিথেয়তাবোধ প্রভৃতি গুনে ভূষিত হতে হবে।[১] উপনিষদ সমূহের তৎকালীন যে পাঠক্রম বর্ণিত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে পাঠ্য বিষয় হিসাবে বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, গণিত, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, যুদ্ধবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, লক্ষণ জ্ঞান প্রভৃতি বিষয় ছিল। এছাড়া পরলোক সংক্রান্ত জ্ঞান, শব্দার্থতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা এবং নৃত্যগীত শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে গণ্য হত। এই তালিকা থেকে প্রমাণিত হয় যে পরবর্তীকালে বেদাঙ্গ হিসাবে ছয়টি শাখার বিকাশ হয়েছিল যথা শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, কল্প ও জ্যোতিষ, প্রাথমিকভাবে সেই সকল বিষয়ই উপনিষদের যুগে ছাত্র পাঠ্য ছিল।[২] এই মৌখিক পাঠের ঐতিহ্যই সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে এতকাল ধরে অবিকৃতভাবে রক্ষিত আছে এবং ছাত্রদের পাঠ যাতে নির্ভুল হয় এবং উচ্চারণ যাতে বিশুদ্ধ হয় সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখা হতো।

সুতরাং প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল মূলত ধর্মীয় রীতিনীতির মোড়কে সে সময়ের সামাজিক চাহিদাগুলি জোগান দেওয়ার জন্য। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এইভাবে শিক্ষিত করা হতো যাতে তারা একই সাথে নিজেদের প্রয়োজন পূরণের সাথে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ পূরণ করতে পারে। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে এই প্রথা গুলো ছিল বৈদিক ও প্রাক্ বৈদিক যুগের ধর্মীয় ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন। উদাহরণস্বরূপ এটা ধরে নেওয়া কষ্টকর যে যুদ্ধবিদ্যা প্রাক্ আর্য সভ্যতায় শিক্ষার একটা অংশ ছিল যেরকম আর্য সভ্যতায় কারুকার্য খচিত মাটির পাত্র তৈরি করা এবং অলংকার শিল্পের উৎকর্ষতার শিক্ষাও খানিকটা অসম্ভব ছিল। সমাজ,ধর্ম,

আচার ও চাহিদার প্রেক্ষিতে আর্য ও প্রাক্ আর্য সভ্যতার সংমিশ্রণে একটা নতুন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন হয়েছিল সময়ের সাথে পা মিলিয়ে চলার জন্য।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিহার গুলিকে কেন্দ্র করে নূতন এক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এ প্রসঙ্গে নালন্দার নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের জৈনবিহার গুলিও বিদ্যা চর্চার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গুরুকুল আশ্রম এবং বিহারের মধ্যে পার্থক্য ছিল যে বিহারগুলো ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ উপনিবেশ বিশেষ। আশ্রম তা ছিল না। আশ্রমে গুরুর সঙ্গে শিষ্যের ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হত। তাই এক একটি আশ্রমে শিষ্যর সংখ্যা খুবই পরিমিত হত। অন্যদিকে বিহারের সংগঠন হত অনেক ব্যাপক। বহু সংখ্যক শিক্ষার্থী সেখানে সমষ্টিগত ভাবে জীবনযাপন করতো এবং তাদের সংগঠন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হত। আশ্রম ছিল গৃহের প্রতিরূপ। আবার মৌর্য ও মৌর্য পরবর্তী যুগের গিল্ড গুলো কারিগরী শিক্ষাদানে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিল। খনিবিদ্যায়, ধাতুবিদ্যায়, বয়ন ও রঞ্জন শিল্পে এবং সূত্রধরের কাজে উন্নতি তখন গিল্ড গুলির কল্যাণেই সম্ভব হয়েছিল। এইসব ক্ষেত্রে যে দর্শনীয় অগ্রগতি হয়েছিল তার পরিচয় তৎকালীন মুদ্রা এবং মৌর্য যুগের স্তম্ভ সমূহে পাওয়া যায় । পরবর্তী কুষান ও গুপ্ত যুগে ধাতুবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত ইত্যাদির আরো উন্নতি ঘটেছিল।

ইসলামিক যুগে প্রাথমিক শিক্ষা মক্তবের মাধ্যমে এবং উচ্চশিক্ষা মাদ্রাসার মাধ্যমে দেওয়া হত। শিক্ষা ব্যবস্থা ধর্মের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল এবং শিক্ষার লক্ষ্য ছিল মানুষকে ধর্ম মনস্ক করা। ইসলামীয় শিক্ষার প্রচারের সাথে সাথে বস্তুগত সম্পদ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধিই ছিল মূল লক্ষ্য।

ইসলামিক যুগের শেষের দিকে জাতিগত উত্তেজনা, ধর্মান্তকরণের হুমকি এবং বেন্থামপন্থী শাসকদের সমাজ সংস্কারে প্রবল উৎসাহ ইত্যাদি ভারতীয়দের বাধ্য করে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাদের নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে। এরই পরিনামে বার্নাড কোনের ভাষায় সংস্কৃতির "নৈর্ব্যক্তিকরণের" (অবজেক্টিফিকেশন) প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। শিক্ষিত ভারতীয়রা তাদের সংস্কৃতিকে একটি অবয়ব দেওয়ার চেষ্টা করে যাতে সহজেই নিজেদের সংস্কৃতিকে প্রদর্শন করা যায়, তুলনা করা যায়, উল্লেখ করা যায়। সংস্কৃতি সম্বন্ধে এই নতুন চিন্তা ভাবনা উনিশ শতকের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে অংশত প্রকাশ পেয়েছিল।[৩]

বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নাগরিকদের মানসিকতায় উপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার সাংস্কৃতিক hedgemony বা কর্তৃত্ব, একধরনের দোদুল্যমানতার জন্ম দিয়েছিল। যে ইংরেজ এই বাঙালি মধ্যবিত্ত যুবককে পাশ্চাত্য উদারনীতির তত্ত্বে শিক্ষিত করেছে, শেলী ও বায়রনের কাব্যে দীক্ষিত করেছে, সেই ইংরেজই চাকুরী ক্ষেত্রে এই শিক্ষিত বাঙালিদের দৈনন্দিন অপমানিত করছে, সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পক্ষপাতমূলক আচরণ করছে। এই ইংরেজেরই আনুকূল্যে বাঙালি মধ্যবিত্ত করে খাচ্ছে; অথচ অপমান সহ্য করতে হচ্ছে। এই অসংগতিবোধ উনিশ শতকের বাঙালি বুদ্ধিজীবিদের মননে পীড়াদায়ক ছিল।[৪] যদিও এক অর্থে ইংরেজি শিক্ষা নতুন নতুন পেশার দৌলতে মূলত উচ্চ শ্রেণী ও পুরোহিত শ্রেণী সেই একই সব প্রাধান্য কারী শ্রেণি গুলির প্রাধান্যের ক্ষেত্রকেই আরো বিস্তৃত করেছিল।

রেনেসাঁ অর্থাৎ নবজাগরণে ভারতীয় সভ্যতাকে নতুন করে পুনরায় আবিষ্কার করা এবং তাকে শুদ্ধ করার চেষ্টা হয়, যাতে ভারতীয় সভ্যতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, একেশ্বরবাদী, অভিজ্ঞতাবাদী ও যুক্তিবাদী ইউরোপীয় আদর্শের উপযোগী হয়ে উঠতে পারে অর্থাৎ ভারতীয় সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে কোন অংশে কম নয় বরং আধ্যাত্মিক গুণাবলীতে ভারতীয় সভ্যতা- পাশ্চাত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সেটা প্রমান করার উদ্দেশ্যে জাতীয় সংস্কৃতি অনুসন্ধানের সাক্ষ্য মেলে মারাঠি, তামিল, তেলেগু হিন্দি ইত্যাদি মাতৃভাষা সাহিত্যের বিকাশে, নতুন চিত্র শিল্পের বিকাশে এবং নারীবাদী নতুন আদর্শ নির্মাণে।

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে ইঙ্গ ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি প্রচার শুরু করে দেয় যে শিক্ষা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অসন্তোষ ও অবাধ্যতা সৃষ্টি করছে। এটা শুনে সরকার ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ৩১ শে মার্চ বাংলায় শিক্ষার খরচ কমাবার প্রস্তাব পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়। ইংরেজি শিক্ষার পরিবর্তে মাতৃভাষার মাধ্যমে জন শিক্ষা উন্নয়নে সেই টাকা খরচের প্রস্তাব দেওয়া হয়। এতে শিক্ষিত ভারতীয়রা ভীত ও আশাহত হয় এ মর্মে যে করবৃদ্ধি ও উচ্চ শিক্ষা খাতে খরচ কমানোর ব্যাপারটি এমন একটি সময় ঘটেছিল যখন সরকার সেনা বিভাগে, সাম্রাজ্যের স্বার্থ পূরণের উদ্দেশ্যে সামাজিক কাজে এবং হোম চার্জেস খাতে অতিরিক্ত পরিমাণে খরচ করতেই থাকে।[৫]

প্রথমদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল কারণ " এলিট", যারা ঔপনিবেশিক রাজত্বে নিজেদের পেশার অগ্রগতির জন্য দক্ষ হতে চেয়েছিলেন, তারা পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান কলা সম্পর্কে আগ্রহী ছিল কারণ তারা ভাবতো এর মাধ্যমে

সমাজে অগ্রগতি ঘটবে। ব্রিটিশ নীতি নির্ধারকরা যাদের মধ্যে অন্যতম লর্ড মেকলে প্রাচ্য সংস্কৃতিকে নিচু চোখে দেখতেন সেহেতু এরা চেয়ে ছিলেন এমন একটি শ্রেণী তৈরি করতে যারা সমস্ত দিক থেকে পাশ্চাত্য মনস্ক হবে শুধু মাত্র চেহারা ছাড়া। ব্রিটিশ শাসন যন্ত্রের কর্মী যারা হবেন তারা শাসকদের ভাষা বলবে কারণ সেটা সেই সময়ের প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। খ্রিস্টান মিশনারীরা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচারে অন্যতম উদ্যোগী ছিল কারণ তাদের ধারণা ছিল যে এর মাধ্যমে খ্রিষ্টীয় ভারতবর্ষ জন্ম নেবে।

পাশ্চাত্য শিক্ষার যে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব সেটা ছিল ভিন্ন যেটা পথপ্রদর্শক কারীরা আশা করেছিল তার ফলশ্রুতি থেকে। পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে এটা একটা অনুঘটকের কাজ করেছিল, যা শুধুমাত্র পাশ্চাত্য সংস্কৃতির গ্রহণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না।

ভারতবর্ষ খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করল না বরং এই যে নতুন যুক্তিবাদী পথ খুঁজে পাবার ফলে হিন্দুদের যেমন তাদের প্রাচীন ধর্মীয় প্রথা এবং রীতি নীতির প্রতি বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল তেমনি খ্রিষ্টীয় ধর্ম মতের বিরুদ্ধেও তারা বিদ্রোহ করা শিখেছিল। উচ্চশিক্ষার সংস্থাগুলি একদিকে যদিও পাশ্চাত্য সভ্যতার কোন বিশেষ গুণ সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত থাকলেও অন্যদিকে মুক্ত সমতাবাদী গণতান্ত্রিক আদর্শগুলো তাদের কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয় ছিল বৃটেনের সাংবিধানিক রাজতন্ত্র থেকে। এর প্রভাব এতটাই বিস্তৃত হয়ে উঠেছিল যে সে সময়কার শিক্ষা ক্ষেত্রের প্রশাসকরা ভাবনাচিন্তা শুরু করেছিল ব্রিটিশ ইতিহাসকে ভারতীয় স্কুল ও কলেজের পাঠক্রম থেকে বাদ দেওয়া যায় কিনা।*

ভারতীয়দের মধ্যে এই সংস্কৃতি সচেতনতা পরিচয় গঠনের ক্ষেত্রে এবং তার রাজনৈতিক বিন্যাস অনেক সময়ই সামাজিক প্রতিক্রিয়াতে ধরা দিয়েছিল নতুন ধারণার জন্ম হয়ে। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের এই সাংস্কৃতিক মিলনের ফলে এক নতুন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জন্ম হয় যা শিখিয়েছিল যে এই ভারতবর্ষের মাটি সর্ব সংস্কৃতি এবং বিশ্বাসকে একত্রে ধারণ করে সঙ্গে নিয়ে চলার ক্ষমতা রাখে। এবং তারা যতোই একে অপরের থেকে পৃথক হোক প্রত্যেকেই ভারতের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং ইহাই ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতবর্ষের মূল কাঠামো হতে পারে।

ইংরেজি শিক্ষার ফলে এক ধরনের নতুন জ্ঞান সঞ্চয় করে নতুন বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে, যারা ভারতের ইতিহাস সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে চায়, সেহেতু

অতীতের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের প্রতি সংবেদনশীল হয়ে তারা নতুন করে ভারতীয় পরিচয় গড়ার চেষ্টা করে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ছিলেন এদের মধ্যে একজন। এক্ষেত্রে যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হল বাংলা যেহেতু ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার পীঠস্থান ছিল সেহেতু বাংলা থেকেই বিপুল পরিমাণে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উত্থান ঘটে। এই ধরনের একটা সন্ধিক্ষণে রামেন্দ্রসুন্দরের ধ্যান-ধারণা একটা অনিশ্চিত মুহূর্তের দিকে আমাদের এগিয়ে দিয়েছিল যেখানে সংস্কৃতির আত্তীকরণ এবং একাধিক ধ্যান-ধারণার একত্রীকরণ ঘটে। সেটা ছিল মুক্ত বাণিজ্যের যুগ এবং সময়ের সরণিতে এই ধরনের দৃশ্য আবারও আমাদের সেই সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয় যেখানে রামেন্দ্রসুন্দরের ধ্যান ধারণা যে বাস্তবতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা দিয়ে তৈরী তা অকেজো তো নয়ই বরং আজকের আলোচনাতেও তার চিন্তাভাবনার অন্তর্দর্শন নতুন করে আমাদের ভাবায়। রামেন্দ্রসুন্দরের সামাজিক ও রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা ভারতীয় মানুষের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করে এবং ভারতীয় সম্পর্কে তাদের সচেতন করে এবং তাদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলে ও ঐতিহ্য সম্পর্কে এতদিনের নিষ্ক্রিয়তায় নাড়া দিয়ে যৌক্তিকতা এবং ধর্ম নিরপেক্ষতার ধারণা জাগায়। রামেন্দ্রসুন্দরের ধারণা সবসময় অতীতের গৌরব ও আধুনিক ভারতের মধ্যে এক ধরনের সংশ্লেষ ঘটানোর চেষ্টা করে যেটা আজও এই বর্তমান সময়ের পক্ষে উপযুক্ত।

রামেন্দ্রসুন্দরের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তা বিশ্লেষণের করতে হলে সেই সময়ের বাঙালি বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর চিন্তাধারার গতিপ্রকৃতি বুঝতে হবে। ত্রিবেদীর সময়টা ছিল উনবিংশ শতকের শেষ দশক ও বিংশ শতকের প্রথম দুই দশক, যে সময়টা মূলত একটা রূপান্তরের সময়, যেখানে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা তাদের ঐতিহ্য কে অস্বীকার না করে একটা নতুন শতাব্দীর সূচনা করতে চাইছিল। কাজেই ত্রিবেদীর ওই সময়টায় দাঁড়িয়ে যখন আমরা "ত্রিবেদীয়ান সিন্থেসিস" কে আবিষ্কার করার চেষ্টা করি তখন সেটাকে ব্যক্তিগত পছন্দ বা রুচী বলা যায়না বরং তা ছিল সেই সময়কার প্রভাবশালী আধিপত্যকামী বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের চিন্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

রামেন্দ্রসুন্দর ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে রিপন কলেজের পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার অধ্যাপক হন পরে তিনি সেখানের অধ্যক্ষও হন। যেহেতু তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন সেহেতু জগতের রহস্য ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তিনি বিজ্ঞানের আশ্রয় নেন। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্পর্কে রামেন্দ্রের যে ভ্রান্তি নিরসন সেক্ষেত্রে এটা মনে রাখা দরকার যে সেই সময়কার বাঙ্গালীদের মধ্যে যে নির্দিষ্ট মানসিকতা ছিল তাতে তারা এই ধারণার বশবর্তী

ছিল যে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা ও তত্ত্ব এগুলোই চরম সত্য যার বিবর্তন সম্ভব নয় এবং এটার কারণ সম্ভবত এই যে বাঙালি বুদ্ধিজীবিদের জাতিগত সংস্কৃতি, প্রথা, তত্ত্ব, অভ্যাস এগুলো অনাদিকাল থেকে স্থবির।

অপরপক্ষে আমরা দেখি রামেন্দ্রসুন্দর রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয় নিয়ে যে মতামত প্রকাশ করেছেন তাতে কিন্তু তিনি পশ্চিমি সভ্যতার বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা গ্রহণের ক্ষেত্রে মুক্ত উদার ছিলেন। যদিও তিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন নি তবুও জাতীয়তাবাদী ভাবধারা তাকে উদ্দীপ্ত করেছিল এবং তিনি তার দেশকে স্বাধীন ও সমৃদ্ধ দেখতে চেয়ে ছিলেন। সেই কারণেই তিনি সে সময়ের অন্য বুদ্ধিজীবীদের মত পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণ নয় বা একজনকে তার শেকড় থেকে সম্পূর্ণভাবে উৎপাটন করার পক্ষপাতি ছিলেন না, এই ধরনের ধারনার প্রতিধ্বনী সেসময়কার জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যেও দেখা যায়। যে কারণে গান্ধী বলছেন যে তিনি তাঁর ঘরের সমস্ত জানালা খুলে রেখেছেন যাতে সমস্ত জায়গার হাওয়া তার ঘরে প্রবেশ করতে পারে কিন্তু সেই হাওয়াতে তিনি নিজেকে ভাসিয়ে দেবেন না। ত্রিবেদী ছিল এই আন্দোলনের প্রধান অংশ দাতা। তিনি ভারতীয় ইতিহাসে বারবার বিদেশি আক্রমণ এবং ভারতীয়দের পরাজয় এবং বিদেশি শাসনকে গ্রহণ দেখেছেন। এবং তিনি জাতীয় ক্ষেত্রে একতার যে আশু প্রয়োজন তা অনুভব করে ভারতীয় জাতীয় চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা একই ধরনের উদ্দীপনা জাগ্রত করার দরকার মনে করে ছিলেন, এবং তিনি এই ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন এবং ভারতকে একটি দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে তিনি তাদের একতা ও সংহতির ওপর জোর দেন। এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিত দুপক্ষই যাতে কাছাকাছি আসে সে চেষ্টা করেন। তার মতে সহযোগিতা ছিল খুবই প্রয়োজনীয় ভারতীয় জাতিসত্তার ক্ষেত্রে। যেকোন আন্দোলন যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ অশিক্ষিতের সমর্থন না পায় তাহলে তা সফল হতে পারেনা।

ইউরোপ সম্পর্কে ত্রিবেদীর দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখি যে তিনি দেখেছেন পার্থিব বিষয়ে ইউরোপীয়ানরা অনেক বেশি সচেতন এবং এক্ষেত্রে তাদের একটা সক্রিয় ও প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাব রয়েছে যার ফলে তাদের সমাজে পার্থিব সমৃদ্ধি ঘটেছে। এবং তাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। ইউরোপ শুধু যে পার্থিব উন্নতি করেছে তা নয় সে জ্ঞান-বিজ্ঞানে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে। নিজের একটা মহিমান্বিত ছবি তুলে ধরেছে যা ইতিহাসে অতুলনীয়। ভারতীয় ও পশ্চিমী সমাজের মানুষদের মনোভাবের মূল পার্থক্য

বিদেশীর আখ্যায়, ইওরোপীয়দের সক্রিয়তা তাদের সম্পদ, যা তাদের জ্ঞান ও গৌরব অর্জন করতে শিখিয়েছে যেখানে ভারতীয়দের ক্ষেত্রে সাধু সন্তদের মত শান্তি আত্মতুষ্টি এবং অনাসক্তি মানাসিকতার জন্য তারা সমৃদ্ধতা, জ্ঞান এবং গৌরব বিসর্জন দিয়েছিল।

ভারতীয়দের যে আলস্য, নিষ্ক্রিয়তা তা মুছে ফেলতে তিনি রবীন্দ্রনাথ, ব্রহ্মবান্ধবের উদাহরণ দেন। যাদের দুজনের ধারণা ভারতীয় সমাজকে জাতীয়তাবাদের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত করেছিল। মনে হতে পারে যে ত্রিবেদী হয়তো কিছু পরিমাণে প্রাথমিক শিক্ষার বিরোধী ছিল, আসলে শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে তার বিরোধিতা ছিল। সুতরাং কমিশন কে তিনি বলেছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষা পদ্ধতি যেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে আমদানিকৃত হয়েছে সেটা সব মিলিয়ে একটা বিদেশী গাছ লাগানোর চেষ্টা, যেটা বিদেশী মাটিতে বড় করার প্রচেষ্টা চলছে। ত্রিবেদী এ ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনে পুরোপুরি অন্ধতা এবং বর্তমান সামাজিক অনুশাসনের সঙ্গে যা প্রাচীন ভারতের প্রায়োহিক জীবনে এত দিন ধরে জড়িত তার দ্বন্দ্বের সম্ভাবনার কথা বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন এই শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্ররা অর্থ দেবে এবং শিক্ষকরা যেন শিক্ষা বিক্রি করবে এবং ছাত্ররা যেটা কিনবে তার একটা বাজারী মূল্য থাকবে। অন্যভাবে এই-শিক্ষা যেটা অর্থ ও শক্তি অর্জন করতে সাহায্য করবে কিন্তু মনুষ্যত্বের বিকাশে সহায়ক হবে না।

তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা ছিল মূলত প্রয়োজন পূরণের উপায় মাত্র। যা ব্যাক্তির সার্বিক বিকাশ প্রক্রিয়াকে দারুণভাবে উপেক্ষা করেছিল। তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ইস্কুল বলতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘন্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়। মাস্টারের মুখ চলিতে থাকে। চারটার সময় কারখানা বন্ধ হয় ,মাস্টারের কলও তখন মুখ বন্ধ করে। ছাত্ররা দুই চার পয় কলে ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ী ফেরে। তারপর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপর মার্কা পরিয়া যায়।"[৭]

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয় পরিবেশকে তপোবনের সেই আদর্শে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। যেখানে মানুষ ও প্রকৃতির পরস্পরের সাহচর্যে অবস্থান করবে, যে বিদ্যালয় ব্যবস্থায় শিশুরা প্রকৃতি-পরিবেশের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। সহজ সরল প্রাকৃতিক পরিবে শিক্ষার্থীর অনাবিল আনন্দ লাভের মধ্যে দিয়ে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাবে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তায় সহজ-সরল বিদ্যালয় পরিবেশ ছিল একটি

বিশেষ দিক। কারণ সহজ-সরল পরিবেশেই সৃজনশীলতার আদর্শ স্ফুরণ সম্ভবপর হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার হেরফের ও শিক্ষার বাহন এই দুটি প্রবন্ধে মাতৃভাষাকে মাতৃদুগ্ধের সাথে তুলনা করে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা ও তার সার্থকতা তুলে ধরেন। সে সময় রামেন্দ্রসুন্দরের মত বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভারতীয় সমাজের আধুনিকীকরণ ঘটানোর কথা ভাবেন যেখানে একজন তার ভারতীয়ত্ব বা নিজস্বতাকে বিসর্জন দেবে না এবং এটাই ত্রিবেদী কে একইসাথে রক্ষণশীল এবং প্রগতিশীল চিন্তাবিদের তকমা দিয়েছিল।

শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে রামেন্দ্র সুন্দরের ধ্যানধারণার নিচের এই অংশটি পড়লে আমাদের কাছে আরও পরিস্কার হবে। "এই বাংলাদেশে চাষার ছেলে অষ্টম বর্ষে উপনীত হইয়াই যে গুরুর নিকট বিদ্যা লাভে প্রেরিত হয়, তাহার মত সদ্ গুরু জগতে নাই। নিসর্গ দেবতা স্বয়ং গুরুগিরিতে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। রাতি পোহানর সঙ্গে যখন পাখি সব কলরব করিয়া উঠে ও কাননে কুসুমকলি ফুটিয়া উঠে, বাঙ্গলার প্রত্যেক পল্লীর ঘরে ঘরে তখন বালগোপাল রাখাল বেশে সাজিয়া গরুর পাল সঙ্গে মাঠে বাহির হইয়া থাকে, এবং এই গোপাল লীলার অবসরে সে যাহা অর্জন করে, তাহার সহিত সদাশয় বাঙ্গলা গভর্মেন্টের স্থাপিত কিন্ডারগার্টেন প্রণালী মার্জিত গুরু মহাশয়ের পরিচালিত কোন প্রাইমারি স্কুলের টেক্সটবুক কমিটির অনুমোদিত গ্রন্থ রাশির গলাধঃকরণে যে বিদ্যা অর্জিত হয়, তাহার তুলনা চলে না । খোলা মাঠের মুক্ত হওয়ার মধ্যে দৌড়াদৌড়ি, লাফালাফি, গাছের ডালে বসিয়া ঝুলনবাজি, এ ডাল হইতে ও ডালে লাফ, নদী-নালার এপার-ওপারে সাঁতার, ক্রীড়া, কৌতুক, মারামার, হাস্য কলরব স্মরণে আনিয়া এই বৃদ্ধ লেখকেরও হৃদপিন্ডের স্পন্দন উপস্থিত হইতেছে। ইহাতে জড় জগতের সহিত যেরূপ অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ ঘটে, কোনো বোধোদায় বা বিজ্ঞান পাঠের সাহায্যে তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা মাত্র নাই। আকস্মিক ঝড়, বৃষ্টি,বান, তুফান হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা – সেই চেষ্টা সফল দেখিয়া যে শক্তিবৃদ্ধি, সম্মান বৃদ্ধি, মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটে ভূগোল বিবরণ ও স্বাস্থ্য রক্ষা আগাগোড়া কণ্ঠস্থ করিলেও তাহার তুল্য হয় না। আট বৎসরের বালক যাহার উপর কৃষক পরিবারের সর্বস্ব ধন গাভী গুলির রক্ষাকার্য্য সমর্পিত আছে, সেই গাভীগুলিকে খোলা মাঠে ছাড়িয়া দিয়া, গাছের ডগার উপর হইতে তাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখিয়া তাহাদের গায়ের রঙ ও গলার ডাকের সহিত পরিচয় হইয়া, ঝড়, জল ও বাঘের মুখের উপস্থিত বিপদ হইতে তাহাদিগকে বাঁচাইয়া আনিয়া দিনান্তে আপন ঘরে ফিরিয়া আসা- এই বৃহৎ কার্য্য

সুসম্পন্ন করিয়া, এই বৃহৎ দায়িত্ব দিনের-পর-দিন বহন করিয়া, তাহার মনুষ্যত্ব যে বলবান হয়, তাহার আত্মমর্যাদা যেমন ফুটিয়া ওঠে, তাহার কর্তব্যবুদ্ধি মধ্যে যেরূপ জাগ্রত হইয়া ওঠে, কোন্ পাঠশালা কোন্ শিক্ষা তাহার নিকট পৌছাইতে পারে। বর্তমান কালের প্রাইমারি স্কুলে বিদ্যালাভ করিয়া, বামন কায়েতর ছেলে, সঙ্গগতি বিকিলে পড়িতে যায় ও শেষ পর্যন্ত তাদের অনেকের একটা সঙ্গতি হয়। কিন্তু চাষার ছেলে, তাঁতির ছেলে, মুদির ছেলে, যাদের জন্য মুখ্যত এই লোকশিক্ষা, তাহাদের পরিণামটা একবার চিন্তনীয়। প্রাইমারী ইস্কুল হইতে বাহির হইয়া অর্থাভাবে তাহারা ইংরেজি স্কুলে প্রবেশ করতে পারে না, এদিকে চাষার ছেলে লাঙল ধরিতে,তাঁতীর ছেলে তাঁতে বসিতে, মুদির ছেলের তুলাদাঁড়ি হাতে লইতে লজ্জাবোধ করে। এগজামিন পাশ করিয়া তাহারা ভদ্রলোকে পরিণত হইয়াছে: জুতা জামা, ছাতা ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া "ইতর" কাজে হাত দিতে পারে না। অগত্যা তাহারা উকিল মহাশয়ের মুহুরী বা আদালতের পেয়াদা হইয়া জামা, জুতা, ছাতার কড়ি যোগাইবার জন্য ঘুষ খায় এবং দুষের পয়সায় মদ খাইতে ধরে। যাদের এই কর্ম্মও না জুটে, সে নিতান্তই অকর্মা হইয়া যাত্রার দল করে ও গাঁজা খায়। অধিকাংশ ছেলের প্রাইমারী ইস্কুলে অর্জিত বিদ্যার এই পরিণাম। ফলে, শিক্ষার সহিত আমার বিরোধ নাই, শিক্ষা প্রনালীর সহিত আমার বিরোধ; শিক্ষা বিড়ম্বনার সহিত আমার বিরোধ।"[৮]

আজকের ভারতের ত্রিবেদীর দৃষ্টিভঙ্গির আশু প্রয়োজন যেহেতু আজ আমরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন একদিকে আমরা দেখছি রাজনৈতিক নেতারা বিভেদমূলক রাজনীতি চালাচ্ছে। এবং সাম্প্রদায়িক এজেন্ডাকে হাতিয়ার করে ১৯৪৭ এর মতো আজও ভারতকে টুকরো টুকরো করতে চাইছে এবং আঞ্চলিক রাজ্যগুলোর মানুষরা সকলময় জাতীয় দৃশ্যতে উপেক্ষিত এবং তাদের সংস্কৃতিও উপেক্ষিত। একটা সাধারণ উদাহরণই যথেষ্ট এখানে। স্বাধীনতার ৭৩ বছর পরও উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্য গুলোর ইতিহাস আধুনিক ভারতের ইতিহাস সেভাবে কতটুকু স্থান পেয়েছে। ইতিহাসে বেশিরভাগই পড়ানো হয় দরবারী ইতিহাস যার সাথে সাধারণ মানুষ নিজেকে যুক্ত করতে পারে না। এটা এমন নয় যে এই লোকেদের কোন নিজস্ব ইতিহাস নেই কিন্তু জাতীয় ক্ষেত্রে সমানে এদের উপেক্ষিত করে রাখা হয়েছে এবং এ ধরনের বিমাতৃসুলভ আচরণ নেতিবাচক ও বিভাজন মূলক মনোভাবের জন্ম দিয়েছে। এবং এখানেই ত্রিবেদীর চিন্তাধারা ভীষণ "হ্যান্ডি" ।এই অবহেলিত জনতার উপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেওয়া যেটা সংখ্যাতত্ত্বের "জাগলারি" নয় বরং একটা গৌরব ও একাত্মতার

অনুভূতি তার মাধ্যমেই আমরা কিন্তু আমাদের জাতীয় সত্তার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটাতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ইংরেজি শিক্ষা কেবলমাত্র যতোটুকু কেরাণীগিরির সহায়তা করিবে ততটুকু আমরা গ্রহণ করিব, বাকিটুকু আমাদের অন্তরে প্রবেশ লাভ করিবে না, একি কখনো সম্ভব হয়। দীপশিখা কেবল যে আলো দেয় তাহা নহে, পলিতাটুকুও পোড়ায়। তেলটুকুও শেষ করে। ইংরেজী শিক্ষা কেবল যে মোটামোটা চাকরী দেয় তাহা নহে, আমাদের লোকাচারের আবহমান সূত্র গুলিকেও পলে পলে দগ্ধ করিয়া ফেলে।[৯] কোভিড ১৯ এর প্রেক্ষপটে বিবেকানন্দের শিক্ষা দর্শন নতুন করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। বিবেকানন্দের সেই উক্তি গীতা পাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলা উত্তম যেন আবার মনে করতে হচ্ছে। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হওয়া, দৈহিক সুস্থতা বজায় রাখা এইগুলো যেমন সত্যি এবং দৈহিক ভাবে সুস্থ থাকলে মানসিক দিক থেকে অনেক বেশি শক্ত থাকা যায় । বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শারীর শিক্ষা বিষয়টি নতুন আঙ্গিকে ভেবে পঠন-পাঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করে নতুন আঙ্গিকে শিক্ষাদানের বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার।

বর্তমান পাঠদানের পদ্ধতিতে ধনী-দরিদ্র ভেদাভেদ, আধুনিক নেট যুক্ত স্মার্টফোন ব্যবহার করে শিক্ষা, অনেক পরিবারের কাছেই বিলাসিতার বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই ভেদাভেদ দূর করে পাঠদান প্রক্রিয়া চালু রাখা শিক্ষাব্যবস্থার কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। এখানেই বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা তিনি চেয়েছিলেন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের উন্নতি, প্রতিটি হীনবল মানুষকে সবল করে তোলার মধ্য দিয়ে তিনি এক নতুন ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যা রামেন্দ্র সুন্দরেরও স্বপ্ন ছিল যদিও তা অজও অধরা।

প্রান্তটীকা:

১. ভট্টাচার্য্য, নরেন্দ্রনাথ: প্রাচীন ভারতীয় সমাজ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০১, পৃষ্ঠা, ৪৫।
২. তদেব, পৃষ্ঠা, ৪৭।
৩. বন্দোপাধ্যায়, শেখর: পলাশী থেকে পার্টিশন, আধুনিক ভারতের ইতিহাস, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ২০০৪, পৃষ্ঠা, ২৫৩।

৪. বন্দোপাধ্যায়, সুমন্ত: উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান, অনুষ্টুপ, ২০০৮, পৃষ্ঠা, ১৩৩।
৫. বন্দোপাধ্যায়, শেখর: প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা,২৫৭।
৬. রায়চৌধুরি, তপন: Europe Reconsidered, "perception of the west in 19th century Bengal" O.U.P 2000, Page. 2।
৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৯০। পৃষ্ঠা, ৩২৪।
৮. ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (সম্পাদনা): রামেন্দ্র সুন্দর রচনা সমগ্র, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা, ৯।
৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৯০, পৃষ্ঠা, ৩৯২।

গ্রন্থসূত্র:

১. ভট্টাচার্য্য, নরেন্দ্রনাথ: প্রাচীন ভারতীয় সমাজ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০১।
২. চট্টোপাধ্যায়, সুনীল: প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫।
৩. বন্দোপাধ্যায়, শেখর: পলাশী থেকে পার্টিশন, আধুনিক ভারতের ইতিহাস, অরিয়েন্ট লংম্যান, ২০০৪।
৪. সরকার, সুমিত: আধুনিক ভারত, কেপি বাগচী এন্ড কোম্পানি, ১৯৯৩।
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ: রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৯০।
৬. বন্দোপাধ্যায়, সুমন্ত: উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান, অনুষ্টুপ, ২০০৮।
৭. Mahajan, V. D: India since 1526, S. Chand and Company Limited, 1984.
৮. বিবেকানন্দ,স্বামী: বর্তমান ভারত, কলকাতা, ১৯০৫।
৯. গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভাত চন্দ্র: রামমোহন প্রসঙ্গ, কলকাতা, ১৯৪৭।
১০. Metcalf, Thomas, R: Ideologies of the Raj, Cambridge University Press, 1994.

১১. Majumdar, Dipika: Ramendra Sundar Tribedi, study of his social and political ideas, Star printers, Kolkata 1988.

১২. Bhattacharya,Dr.Buddhadeb (ed): Ramendra Sundar Rachanasamagra Kolkata, 1976.

১৩. Bajpayee, Ashutosh: Ramendra Sundar Jivan Katha, Kolkata.

১৪. Paninikar. K. M: Asian Western Dominance, George Allen and Unwin Limited, London. 1959.

১৫. Pramanik, Prahlad, Kumar edited: Charit Katha, Ramendra Sundar Trivedi, Orient Book Company Kolkata 1980.

১৭. Roy, Dhirendra Narayan: Ghare Baire Ramendrasundar, Kolkata 1881.

১৮. Sarkar, Ramatosh: Ramendra Sundar Tribedi Kolkata, 1993.